65 বিশেষ কৃষিঋণ কর্মসূচী - শেরপুর উপজেলার একটি সমীক্ষা

(প্রকাশকালঃ জুন, ১৯৯২)

ক) গবেষকদের পরিচিতি

১) প্রভাস চন্দ্র প্রামানিক, উপ-পরিচালক
বি.কম (সম্মান); এম.কম. (হিসাব বিজ্ঞান), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২) মোঃ ইলিয়াস, উপ-পরিচালক
এম.কম (ব্যবস্থাপনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

খ) গবেষণার উদ্দেশ্য

যে সমস্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চলতি সমীক্ষাটি হাতে নেয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপঃ-

১. ঋণগ্রহীতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা;

২. মাঠ পর্যায়ে ব্যাংকগুলো বিশেষ কৃষিঋণ কর্মসূচীর আওতায় কি পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণ করছে তা দেখা;

৩. কর্মসূচীর অধীনে ঋণ গ্রহীতারা কি ভাবে ঋণটাকে ব্যবহার করছে সেটা লক্ষ্য করা;

৪. বিতরণকৃত ঋণের কতভাগ আদায় হচ্ছে তা যাচাই করা; এবং

৫. ঋণ কর্মসূচীতে কোন ব্যর্থতা থাকলে তা অনুসন্ধান করা এবং সে ব্যাপারে কোন পরামর্শ থাকলে সেটি উল্লেখ করা;

গ) ভূমিকা

বাংলাদেশ সাড়ে এগারো কোটি জন অধ্যুষিত ১,৪৩,৯৯৮ বর্গ কিঃমিঃ আয়তন বিশিষ্ট পৃথিবীর একটি সর্ববৃহৎ বদ্বীপ যা মূলতঃ কৃষি প্রধান দেশ নামে পরিচিত। এর ৯০% ভাগ লোক পল্লী এলাকায় বাস করে যাদের প্রায় সকলেই কৃষি বা কৃষি সংক্রান্ত বিবিধ কাজে জড়িত। এ দেশের কৃষি অভ্যন্তরীন মোট উৎপাদনের (জিডিপি) ৩৭ ভাগ এবং রপ্তানী আয়ের ৮০ ভাগ অবদান রাখে। ভরা মৌসুমে দেশের ৮৫ ভাগ লোকের কর্মসংস্থানের সূচনা করে থাকে এই কৃষি। প্রতি পরিবারে গড় জমির পরিমান ১.৭ একর। পল্লী এলাকার জনসাধারণের ২৮ ভাগ লোক ভূমিহীন যাদের জমির পরিমান .৫০ একর পর্যন্ত। ভূমিহীনসহ ২.৫ একর পর্যন্ত জমির মালিক এ ধরণের মোট কৃষকের সংখ্যা ৭০%। ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র কৃষক হিসাবে চিহ্নিত।

দেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্বাধীনতার পর হতে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মানসে স্বাধীনতার আগে এবং পরে যে উদ্যোগ দেখানো হয় তাতে কৃষি উপকরণ, কৃষি অবকাঠামো ও কৃষিঋণ অধিকমাত্রায় গুরুত্ব লাভ করে।

এ দেশে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হিসাবে কৃষিঋণের ভূমিকাকে স্বীকার করে নেয়া হলেও দেশের কৃষি ব্যবস্থা এমন যে দরিদ্র গ্রামবাসীর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে। তাই কৃষি উৎপাদন কাঙ্খিত পর্যায়ে না পৌঁছার অন্যতম কারণ হিসেবে অনেকেই দূর্বল ঋণ ব্যবস্থাকে দায়ী করে থাকেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ দেশের অধিকাংশ কৃষক হয় ক্ষুদ্র না হয় প্রান্তিক চাষী। যেহেতু এলাকার কৃষি প্রকৃতির জুয়া খেলার শিকার এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মোটেই কৃষকদের অনুকুলে নয় তাই অবিরাম সংগ্রাম করে তাদেরকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। যে বছর আবহাওয়া ভাল থাকে সে বছর ভাল ফসল পাওয়া যায়, আর যে বছর তা হয়না অবস্থা চরমে গিয়ে পৌঁছে। ফলে তারা পরিবার প্রতিপালন এবং কৃষি কাজের জন্য প্রতিনিয়ত অন্যের আর্থিক সাহায্য কামনা করে থাকে। কিন্তু সে অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ কোথায়।

"এ দেশে কৃষকেরা দু'ধরণের উৎস থেকে ঋণ পেয়ে থাকে, যেমন-অপ্রতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ধনী কৃষক, গ্রাম্য মহাজন এবং ব্যবসায়ী। পক্ষান্তরে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাষ্ট্রয়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং সমবায় ব্যাংক। হিসাব করে দেখা গেছে পল্লী ঋণের শতকরা ৮৫ ভাগেরও কিছু বেশী পরিমান অর্থ অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।"

প্রকৃত পক্ষে গ্রাম্য মহাজনেরা যুগ যুগ ধরে এ দেশের কৃষকদের যথা সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান না দিলে এখানকার কৃষি ব্যবস্থা হয়তো ধ্বংস হয়ে যেত এবং কৃষকদের অস্বিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হতো। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে অনানুষ্ঠানিক ঋণের তাৎক্ষনিক ইতিবাচক প্রভাব অনেক সময় নেতিবাচক প্রভাবের কাছে ম্রিয়মান হয়ে দেখা দেয়। কেন না গ্রাম দেশে যে সকল মহাজন কৃষকদের ধার দেয়, তারা যতটা না কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনে নজর দেয় তার চেয়ে অধিক দৃষ্টি দেয় কিভাবে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় ও উন্নত হবে। তারা এত উচ্চ হারে সুদ নেয় যে বকেয়া ঋণ শোধ করতে যেয়ে কৃষকদের অনেক মূল্যবান সম্পদ হারাতে হয়। এমনও দেখা গেছে ৫০/- টাকা ঋণ দিয়ে ৩০০/- টাকা থেকে ৪০০/- টাকার সম্পদ আদায় করে নেয়া হয়েছে। এ ভাবেই বাংলায় কৃষককূলে শোষকের শিকারে যেমন পরিনত হয়েছে ঠিক একই ভাবে তারা ভূমিহীনতার করাল গ্রাসে কবলিত হচ্ছে।

ধনী মহাজনদের নিয়ন্ত্রণ থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য এ দেশে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইন, যথাঃ Indian Usurious Loans Act of 1918, Bengal Agricultural Debtors Act of 1935 and Bengal Money-lenders Act of 1940 তদানীন্তন বৃটিশ সরকার জারী করেছিলেন। কিন্তু সে সব আইন দ্বারা গ্রামীণ মহাজনদের উৎপীড়ন থেকে কৃষকদের উদ্ধার করা মোটেই সম্ভব হয়নি। তাই আজও একই কায়দায় ও ভঙ্গিতে গ্রামের টাকাওয়ালা লোকেরা গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে আছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে পরবর্তী সরকারগুলো প্রত্যেকেই প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দানের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেছেন এবং তা ক্ষেত্র বিশেষে দিয়েছেনও। আমাদের দেশে ১৮৮৫ সালে যে কৃষিঋণ আইন প্রবর্তিত হয়েছিল তারই আওতায় প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ যা তাকাভি লোন নামে পরিচিত চালু করা হয়। যদিও এটিকে লোন আখ্যা দেওয়া হলো মূলতঃ ইহা ছিল সরকারের দূর্যোগকালীন প্রদান যা গ্রহীতারা অনুদান হিসেবে বিবেচনা করতো। এতে সরকারের কোন লাভ হতো না বরং তাদের উপর জনসাধারণের নির্ভরশীলতা বেড়ে গেল। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বিকল্প হিসাবে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার গ্রাম পর্যায়ে ক্রেডিট কোঅপারেটিভ গঠন করে। এক হিসাব মতে ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত (১৯৪৭) এ ধরণের কোঅপারেটিভের সংখ্যা ছিল ২৬,৬৬৪ টি।

১৯৫০ সালের শেষ নাগাদ গ্রামাঞ্চলে এই সমিতির মাধ্যমে সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষায় পরবর্তীতে এমনকি ১৯৬৬ সালেও দেখা যায় যে এ সব প্রাতিষ্ঠানিক

ঋণদাতারা পল্লীর জনসাধারণের মাত্র ১৫ ভাগের ঋণ চাহিদা মেটাতে সম হয়েছে। শুধু তাই নয় ভারত-পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হবার পরে এ দেশে যে তিনস্তর বিশিষ্ট ইউনিয়ন কোঅপারেটিভ মাল্টি পারপাস সোসাইটিস গড়ে উঠেছিল সেখানে সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা থাকলেও সে সুবিধাটুকু সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই কেবল ভোগ করতো। তাই ষাট ও সত্তরের দশকে সমবায় পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়। ফলে সরকার কর্তৃক সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায়ের প্রবর্তন করা হয়। এ ধরণের সমবায়ের ফলপ্রসুতা কুমিল্লার কোতওয়ালী থানায় প্রমাণিত হবার পর এটিকে দেশের সর্বত্র সম্প্রসারিত করা হয়। দ্বি-স্তর সমবায়ের প্রথম স্তরে গ্রাম পর্যায়ে রয়েছে কৃষক সমবায় সমিতি (কেএসএস) এবং উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে সেগুলোর ফেডারেশন উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ)। কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও, ঋণ বিতরণ ও আদায়, সঞ্চয় সংগ্রহ, কৃষি উপকরণাদি যোগান দিয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোই ছিল এ সমবায়ের মূল লক্ষ্য। কিন্তু দেখা যায় যে ঐ লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। গ্রামীণ ঋণ পদ্ধতির যে দুটো প্রধান সমস্যা ঋণ খেলাপী এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ঋণ সুবিধা প্রদানে ব্যর্থ হওয়া এখানেও পরিলক্ষিত হয়।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর প্রাক্তন পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ভেঙ্গে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সৃষ্টি করা হয়। একই সময়ে দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে জাতীয়করণ করে গ্রাম এলাকায় শাখা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি ঋণকে উৎসাহিত করা হয়। ১৯৮০ সালের মধ্যে এ সব ব্যাংকের শাখা সংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। কিন্তু অবস্থার তেমন উন্নতি দেখা যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পদ্ধতিতে পল্লী দরিদ্রের প্রতি যে বৈষম্য তার রূপ প্রায় একই থেকে যায়। ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের ঋণদাতারা আগের মত একই গতিতে একচেটিয়া হারে চড়া সুদে পল্লী দরিদ্র কৃষকদের শোষন করা অব্যাহত রাখে।

বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচী

এই শংকাজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য সরকার ১৯৭৭ সালে পল্লী তথা কৃষির উন্নতিকল্পে বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করেন যা ১০০ কোটি টাকা ঋণ কর্মসূচী নামে পরিচিত। এই ঋণের সঙ্গে সরকার সকল রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে জড়িত করে। এর ফলে কৃষিতে প্রাতিষ্ঠানিক মোট ঋণের পরিমান অনেক বেড়ে যায়। ১৯৭৬-৭৭ সালে যেখানে ৮৬.৪০ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ করা হয় ক্রমানুয়ে তা বেড়ে ১৯৮৮-৮৯ সালে এসে ৮০৭.৬২ কোটি টাকা দাঁড়ায়। কিন্তু দূর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, কৃষিঋণ আদায় পরিস্থিতি মোটেই উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। কেননা ১৯৮০-৮১ সালে সেখানে আদায় করা হয়েছিল ৪৯ ভাগ, ১৯৮৮-৮৯ সালে তা নেমে আসে ২০ ভাগে।

এখন দেখা যাক বিশেষ কৃষিঋণ কর্মসূচী গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো কি ছিল ঃ

- কৃষি খাতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমান বৃদ্ধি করা;
- বেশীমাত্রায় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কৃষি ঋণের সাথে জড়িত করা;
- তাৎনিকভাবে ভ্রাম্যমাণ ইউনিট তৈরীর মাধ্যমে ক্ষুদে কৃষকদেরকে সেবাদানের লক্ষ্যে বিপুল পরিমান প্রাতিষ্ঠনিক নেটওয়ার্কের সৃষ্টি করা;
- কৃষি উপকরণের সাথে ঋণের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- একটি ঋণ থাকা অবস্থায় আরেকটি ঋণ দিলে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তার প্রতিবিধান করা;
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার এবং স্থানীয় প্রশাসন যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে ঋণের সুষ্ঠু বন্টন ও যথাসময়ে আদায় নিশ্চিত করা;
- কৃষিতে কারিগরি সহায়তা দানের লক্ষ্যে সম্প্রসারণ কর্মসূচীকে অন্তর্ভূক্ত করা।

উক্ত বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচীর অধীনে ঋণ বিতরণ পদ্ধতি বেশ সহজ ছিল এবং জামানত দরকার হতো খুব সামান্য। তাই যাদের জমি ছিল তারা যেমন ঋণ পেতেন মালিকেরা নিশ্চয়তা দিলে বর্গাচাষীও ঋণ পাবার সুযোগ লাভ করতো। কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য ছিল সকল ধরণের কৃষককে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ঋণ সরবরাহ করে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এ বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর উপর তেমন কোন study হয়েছে বলে জানা নেই। কৃষিঋণ সম্পর্কে যে সমস্ত study অতীতে সম্পন্ন হয়েছিল (বিবরণ পরে দেখা যাবে) তাতে দেখা গেছে কৃষি উৎপাদন কিছু বাড়লেও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কর্মসূচীর ন্যায় এখানেও গরীব কৃষকরা ঋণ থেকে দূরে থেকে গেছে।

কৃষি ঋণ সংক্রান্ত যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচীর কথা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করা হলো এর কোনটিই পল্লী দরিদ্র কৃষকদের জন্য সফলতা বয়ে আনতে পারেনি। এর পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে যার অনেকগুলোই ঋণ বিতরণ, ঋণের ব্যবহার ও ঋণ আদায় সংক্রান্ত সমস্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। সেই সমস্যাগুলো সতর্কতার সাথে চিহ্নিত করে জানিয়ে দিতে হবে কি পদক্ষেপ নিলে ঋণ কর্মসূচীতে সফলতা আনয়ন সহজতর হবে। তাই এখানে একটি জরীপের মাধ্যমে শেরপুর উপজেলায় বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচীর ফলাফল যাচাই করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।